মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্যের সমাজ-পরিপার্শ্ব

কল্লোল যুগে বাংলা সাহিত্যে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আবির্ভাব। প্রচলিত বিদ্রোহ গতানুগতিকতা পরিহার করতে উৎসাহী করলেও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় জীবন ও সমাজ জীবনের অবক্ষয় তার সাহিত্যের মৌল প্রতিপাদ্য করেছিলেন। কল্লোলের কবিরা রবীন্দ্র কাব্যের পদ্ধতিগত দিক ও বক্তব্য বর্জন করতে প্রয়াসী ছিলেন। নতুন ধারার কবিতা নির্মাণে প্রত্যয়ী কবিকুল রবীন্দ্র প্রভাবমুক্ত হতে পেরেছিলেন বলা যায় না। তারা অগ্রসর হয়েছিলেন। তাদের ভাষ্য, বক্তব্য নতুন চমক তৈরি করেছিল। পরবর্তী সময়ে আধুনিক কবিতার নতুন দিগন্ত চিহ্নিত করতে কল্লোলের কবিদের নিরীক্ষা দিকনির্দেশনা তৈরি করেছিল। ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করলেও শ্রেণীস্বার্থ রক্ষায় শাস গোষ্ঠী ও সমাজপতিরা তৎপর ছিল। এদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে হয় সাহিত্যকর্মীদের। তারাশঙ্কর ঐতিহ্য অন্বেষণ ও শোষিত মানুষদের জীবন আলেখ্য রচনায় এগিয়ে এসেছিলেন। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় একই পথ ধরে এগিয়ে গ্রামীণ জনপদের মানুষের মনস্তাত্ত্বিক টানাপোড়েন, ক্ষয়িষ্ণু সমাজ ব্যবস্থার চিত্ররূপ অংকন ও মানুষের মধ্যে স্বপ্নকে বাঁচিয়ে রাখার প্রনোদনা যুগিয়েছিলেন। তার সাহিত্য বর্ণিল বিভায় উদ্ভাসিত। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ধ্রুপদীধারার সাহিত্য রচনা করে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। তার রচিত গল্প ও উপন্যাসে মানুষের মর্ম বেদনা, সমাজ ও চারপাশের বর্ণিল চিত্র পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। মানুষের জীবন সংগ্রাম, পাওয়া না পাওয়া, প্রাপ্তি ও অধিকার বঞ্চনার গল্পগাথা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় দক্ষ কারিগরের মতো বিধৃত করেছেন। নর-নারীর সম্পর্কের বহুমাত্রিকতা দক্ষতায় তিনি গল্প ও উপন্যাসের সন্নিবেশিত করেছিলেন।

১৯২৮ থেকে ১৯৩৫ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত বিচিত্রা, বঙ্গশ্রী ও ভারতবর্ষ পত্রিকায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ব্যতিক্রম ও নিরীক্ষা গল্প প্রকাশিত হয়েছিল। 'অতসী নামা' গল্পে শরৎচন্দ্রের প্রচ্ছন্ন প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। ১৯৩৫-এ প্রকাশিত হয়। অতসীনামা ও অন্যান্য গল্প। ১৯৬৩-এ প্রকাশিত ধ্রুপদী আঙ্গিকের উপন্যাস 'পদ্মা নদীর মাঝি' ও 'পুতুল নাচের ইতিকথা' তাকে বিশেষভাবে পরিচিত করে। একই সময় প্রকাশিত 'জীবনের জটিলতা' উপন্যাস গৌণ রচনা হিসেবে বিবেচিত।
'পদ্মা নদীর মাঝি' উপন্যাস নদীর উত্তাল জীবনে জেলেদের বাঁচা-মরার আখ্যান নিয়ে লিখিত। পদ্মা উপকূলের মানুষের জীবনের সুখ-দুঃখ, আশা-নিরাশা, স্বপ্ন-স্বপ্ন ভঙ্গের বেদনা, প্রেম-এবং রুক্ষতার বিভিন্ন দিক তার লেখনীর মূল উপজীব্য। উপকূলের জেলেদের জীবন একইভাবে প্রবাহিত নয়। সচ্ছলতা থাকলে জীবনের চাহিদা পুরণের দিক অগ্রগণ্য হয়।

বর্ষায় ইলিশ উঠলে জেলেদের জীবনে সচ্ছলতা আসে। সবার জীবন অর্থ-কষ্টে কাটে অন্য সময়। জীবন পর্যবেক্ষণ, ভঙ্গুর সমাজব্যবস্থায় রূপান্তর মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রত্যক্ষ করেছেন। পদ্মা উপকূলবর্তী

মানুষদের সততা, কর্তব্যনিষ্ঠতা প্রবল। আবার মতলববাজ ও সুবিধাভোগী মানুষের কপটতা, স্বার্থচিন্তা, ও দুরভিসন্ধি তীব্রতা পায়চরের জীবনপ্রবাহ ভিন্ন আবহের সৃষ্টি করে। চরিত্র সৃষ্টি, কাহিনী বর্ণনা ও সংলাপের মাধ্যমে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় অজানা অধ্যায়কে প্রাণবন্ত করে উপস্থাপন করেছেন। মৎস্যজীবী মানুষদের কুসংস্কার, সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি ও সমাজের নিষ্পেষণ তাদের চিন্তা- চেতনা ও তাদের জীবনযাপনকে বদলে দেয়। উপন্যাসের নায়ক কুবের ধীবর সম্প্রদায়ের উজ্জ্বল প্রতিনিধি। নদীতে ভেসে বেড়ানোর মধ্যে সে জীবনের অর্থময়তা আবিষ্কার করে। ইলিশ মাছ ধরা, মাছের গন্ধ গায়ে মেখে ঘুরে বেড়ানো ও নদীতে ভেসে বেড়ানোর বিচিত্র অভিজ্ঞতা তাকে দ্রোহী ও সাহসী উত্তাল পদ্মার সৌন্দর্য উপন্যাসের প্রথম পর্যায়ে বিবৃত হয়েছে। জেলে নৌকাতে যে বাতি জ্বলে তা জোনাকির মতো জ্বলজ্বলে হয়ে অপরূপ মুগ্ধতার বিস্তার করে। থই থই পানি বিচিত্র শব্দ তরঙ্গের সৃষ্টি করে। শীতের সময় পদ্মার জলরাশি শান্ত থাকে। কিন্তু পদ্মা তার রূপ বৈচিত্র্য হারায় না। শান্ত ও অশান্ত পদ্মা দুই-ই সৌন্দর্যের আধার। মাদক ব্যবসায়ী হোসেন মিয়া পদ্মা নদীর মাঝি উপন্যাসের আরেক আকর্ষণীয় চরিত্র। হোসেন মিয়া পুলিশের আগমনের খবর পেয়ে নদীতে আফিম ও অন্যান্য সামগ্রী ফেলে দেয়।

মৎস্যজীবী মানুষের বিচিত্র স্বভাব মানিক তার উপন্যাসে বন্দি করেছেন। মৎস্যজীবীরা শোষণ বঞ্চনার শিকার। কেউবা আর্থিক দৈন্য মোচন করতে চৌর্যবৃত্তি বেছে নেয়। কোন কোন মানুষ প্রতিবাদ করে। মাছ ধরে ও বিক্রি করে অনেকের জীবিকা নির্বাহ হয়। শীতল চুরি করে। ধনঞ্জয় নৌকা ও জালের মালিক। যত মাছ কুবের ধরে তার অর্ধেক ধনঞ্জয়কে দিতে হয়। রাতারাতি কিছু মানুষ অবৈধভাবে বিত্তবৈভবের মালিক হয়ে দাপুটে জীবনযাপন করে। এরকম মানুষদের প্রতিনিধি ধনঞ্জয় একটি দীপের মালিক হয়ে যায়। ধনঞ্জয় মাছ বিক্রির সময় কুবের ও গণেশকে বাইরে রেখে মাছ বিক্রির ন্যায্য পাওনা থেকে তাদের প্রাপ্য অর্থ না দেয়ার মধ্যে প্রতারণা অবলম্বন করে। পদ্মা উপকূলের মানুষের সাংস্কৃতিক উৎসব উদযাপনের চিত্র এ উপন্যাসে পরিস্ফুট হয়েছে। 'রথমেলা' সোনাখালিতে উদযাপিত হতে দেখা যায়। আশ্বিনের ঝড় ও বর্ষার বন্যা মানুষকে কতটুকু সহনশীল ও আত্মরক্ষায় যত্নবান করে তা এ উপন্যাসে পাওয়া যায়। কিছু মানুষ অবস্থানগত কারণে প্রতিবাদে অভ্যস্ত হতে পারে না। মানুষের তৈরি নিয়ম-কানুন ও প্রকৃতির রুদ্র আচরণের কাছে তারা সমর্পিত হয়।

জেলেপাড়ার মানুষরা সব সময় বিদ্রোহ করতে পারে না। অর্থনৈতিক নিরাপত্তাহীনতা ও সামাজিক অবস্থা তাদের গতানুগতিক জীবনযাপনে অভ্যস্ত করে। স্ত্রীর বোন স্বামী পরিত্যক্ত কপিলার সঙ্গে কুবেরের অন্তরঙ্গ সম্পর্ক গড়ে। সে স্ত্রী মালা ও সন্তান লখা ও চণ্ডীকে ফেলে হোসেন মিয়ার অধিকৃত ময়নাদ্বীপে আশ্রয় নেয়। পুলিশের ভয় ও পদ্মা উপকুলের সামাজিক রক্তচক্ষু তাকে পালাতে প্রলুব্ধ করে। কুবের-কপিলার মনস্তাত্তিক টানাপোড়েন এ উপন্যাসে সক্রিয় থেকেছে। আমিনের বাড়িতে কুবের ও কপিলার শারীরিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে। প্রকৃতি ও মানবসত্তার মেলবন্ধন যেন রূপবৈচিত্র্য সৃষ্টি করে তার বর্ণনা এসময় প্রত্যক্ষ করা যায়। কপিলাকে এক সময় স্বামীগৃহে প্রত্যাবর্তন করতে হয়। বিরহকাতর কুবের কপিলার সাথে দেখা করতে গেলে কপিলা বলে 'পুরুষদের পরান পোড়ে কয়দিন?

গাঙের জলে নাও ভাসাইয়া দুরদেশে যাই ও মাঝি ভুইলো আমারে! (পৃঃ ১৫৪)
কুবের হোসেন মিয়ার ইচ্ছার কাছে পরাজিত হয়। সে হোসেন মিয়ার দ্বীপে আশ্রয় খুঁজে সাময়িক মুক্তি পেতে চেয়েছে। কুবেরও তাকে কেন্দ্র করে যেসব চরিত্র আন্দোলিত হয়েছে তারা বাংলাদেশ ভুখন্ডের সংস্কৃতি লালন করে জীবনপ্রবাহে যুক্ত হয়েছে। আঞ্চলিক ভাষা স্বর্তঃস্ফুর্ত উচ্চারিত হয়। রোমান্টিক মানস প্রবণতার অধিকারী উপন্যাসে পাত্র-পাত্রী স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যে চিহ্নিত। উপমা ও রূপকল্প সৃষ্টি করে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় জনপদের মানুষদের তুলে ধরেছেন।

‘পুতুল নাচের ইতিকথা’ উপন্যাস মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ধ্রুপদী ধারার অন্যন্য সৃষ্টি। সমাজ-পরিপার্শ্বের মধ্যে মানুষের কৌতুহল ও জীবনযাপনের বিচিত্র বোধ উপন্যাসে আবর্তিত। উপন্যাসের নায়ক শশী তরুণ চিকিৎসক। শিক্ষিত মধ্যবিত্তের কল্পনাবিলাস তরুণ চিকিৎসকের মধ্যে পুরাদস্তর বিরাজমান। স্যাটয়োর, হৃদয়াবেগ তাকে সংযমী ও নিয়ন্ত্রিত হতে বাধা দেয়নি। শশীর বাবা গোপাল। মধ্যবিত্তের যে উদারতা থাকে তা তার মধ্যে নেই। তিন বৃদ্ধের স্ত্রী সংযোগে তার ধুর্তামী আছে। লম্বা কালো চেহারার বেপরোয়া খ্যাপাটে স্বভাবের বু কুমুদের সংস্স্লর্শে এসে শশীর স্বভাব বদলে যায়। গ্রামে এসে শশীর যখন দম বন্ধ হয়ে আসার উপক্রম হলে কুমুদ তাকে চিন্তা-ভাবনা ও স্বস্তির পরশ বুলিয়ে দিয়ে মানসিক শক্তি অর্জনে সাহায্য করেছিল। গ্রামে লাইব্রেরি নেই। একাত্ম হতে না পেরে সে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। গাওদিয়ায় মতি ও কুসুম উপন্যাসে ভিন্ন কৌণিক অবস্থান চিহ্নিত করে। দুই নারী চরিত্র বিপরীতমুখী। অশিক্ষিত মতি শোভন গৃহকোণ পছন্দ করে। তার সরলতা বিশেষ আকর্ষণীয়। সম্স্লূর্ণ বিরুদ্ধ স্বভাবের কুসুম প্রতিবাদী। সে বেপরোয়া জীবনযাপনে অভ্যস্ত। মতি কুমুদের বোহেমিয়ান স্বভাবে অনুরক্ত হয়ে গাওদিয়ার সাথে তার সম্পর্ক চুকিয়ে দেয়। কুসুম শশীর সাথে সম্স্লর্কের জটিল সুতোয় আটকে যায়। শশী কুসুমকে উপযুক্ত মর্যাদা দিতে পারেনি। অবহেলা পেয়েছে কুসুম। উপন্যাসের আরেক বিশেষ মনোযোগী চরিত্র ‘বিন্দু’। নন্দলালের স্ত্রী হতে সে পারেনি। রক্ষিতা হয়েই থেকেছে। শশীর জীবনে যেসব নারী ছিল তারাও হারিয়ে যায়। দেখা যাক মানিক বন্দোপাধ্যায় কিভাবে শশীকে তুলে আনেন ‘তালবনে শশী কখনো যায় না। মাটির টিলাটির উপর উঠিয়া সূর্যাস্ত দেখিবার সখ এ জীবনে শশীর আসিবে না।’

বিক্রমপুর জনপদে বাংলার রাজধানী স্থাপিত হয় দেড় হাজার বছর আগে। বিত্ত, বৈভব, শিল্প-সংস্কৃতির বিকাশ বিক্রমপুরে স্বতন্ত্রধারায় বিকশিত হয়েছে। রাজধানী হিসেবে নিরংকুশ সম্ভাবনা লালন করেছে এই জনপদ। ‘পুতুল নাচের ইতিকথা’ উপন্যাসে বিক্রমপুরের গাওদিয়া গ্রামের চিত্র পরিস্ফুট হয়েছে। নদীমাতৃক বিক্রমপুরের মানুষ জীবনসংগ্রামী। পদ্মার রুদ্র ও শান্ত স্বভাবের মতো এই অঞ্চলের মানুষের সুকুমারবৃত্তি ও জীবনযাপন প্রবাহিত। মানিক বন্দোপাধ্যায়ের মামারবাড়ি ছিল বিক্রমপুর। এই বিক্রমপুরের সাথে তার অন্তরঙ্গ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। সেই গাওদিয়া কালের গর্ভে বিলীন হয়ে গেছে। মতি, কুমুদ, সেনদিদি, গোপাল যামিনী কবিরাজের চরিত্র চিত্রনে মানিক রূপকল্প ও রহস্যময়তার যে আশ্রয় নিয়েছেন তা হৃদয়গ্রাহী। গাওদিয়ার প্রকৃতি, নদী ও মানুষের বিত্রিবোধকে ধারণ করে তিনি কাহিনীর গভীরে প্রবেশ করেছেন। তালবন, বৃক্ষের শনশন শব্দ ও সবুজ অরণ্যানীর বর্ণনা মানিকের

বিশেষ কবিত্ব আশ্রয়ী ভাবনার প্রতিফলন। কুসুমের মুখ থেকে উচ্চারিত বর্ণনা থেকে আমরা প্রত্যক্ষ করি একজন নারী কীভাবে নিজেকে আবিষ্কার করে' কি করে বুঝবেন মেয়ে মানুষের কত কি হয়। সব বোঝা যায় না, হলেইবা ডাক্তার, এতো জ্বর-জ্বালা নয়। দশ বছর খেলে করেও সাধ মেটেনি? আমরা মুখ্য গেয়ো মেয়ে এসব খেলার মর্মতো বুঝিনা। কুসুম এ জনপদের হাজারো মানুষের একজন উজ্জ্বল প্রতিনিধি। মানিক বন্দোপাধ্যায় মানুষের মনস্তত্ত্ব ও জটিল জীবন অন্বেষা 'পুতুল নাচের ইতিকথা' উপন্যাসে তুলে এনেছেন। সৃষ্টি কুশলতায় প্রত্যেক চরিত্র তার কাছে জীবন্ত ও সহজবোধ্য হয়ে ফুটে উঠেছে। সমাজ-সংসার যে ভালোবাসার ফল্গু ধারায় আবিষ্ট তার পুর্ণ চিত্রায়ন মানিকের উপন্যাসে পাওয়া যায়। 'পুতুল নাচের ইতিকথা' উপন্যাসে অসংখ্য চরিত্র। এই সব চরিত্র কোন সরল কৌণিক কাহিনীকে ঐক্যসুত্রে গ্রন্থিত করেনি। মানুষের সরলতা ও আন্তরিকতা সপ্রতিভ। সরল মানুষের পাশাপাশি জটিল মানুষ, বিচিত্র সামাজিক পরিমন্ডল ও মানুষের বহুমাত্রিক আকাপক্ষা উপন্যাসের ক্যানভাসে বন্দি হয়েছে। দার্শনিকতা ঘিরে আছে কাহিনী বিস্তারে। বিদেশী কাহিনীর প্রভাব ও প্রতিভাস এ উপন্যাসে প্রচ্ছন্নভাবে উঠে এসেছে।

জীবিকার প্রয়োজনে যারা বিচিত্র পেশা অবলম্বন করে তাদের জীবনের নানা গল্প এ উপন্যাসে এসেছে। মানিক বন্দোপাধ্যায় উচ্চারণ করেন এভাবে ঃ হয়তো একদিন ওদের প্রেম নীড়ের আশ্রয় খুঁজিবে, হয়তো একদিন শিশুর প্রয়োজনে নীড় না বাঁধিয়া ওদের চলিবে না' এ উচ্চারণ দ্রুত কাহিনীর গভীরতা স্স্লর্শ করে।

মানিক বন্দোপাধ্যায় 'চতুষ্কোণ' উপন্যাসে মানব-মানবীর জৈবিক কামনায় বিষয়টি প্রাধান্য পেয়েছে। রাজকুমারের জীবনে চারজন নারী গিরি, মালতী সরসী, রিনিরের প্রেমের ভিন্নমাত্রিকা মানিক গভীর মমতায় বর্ণনা করেছেন। মালতীর প্রেমকে রাজকুমার ছুঁতে পারেনি। মালতী যখন চুম্বন স্স্লর্শ টেনে রাজকুমারের শারীরিক সম্স্লর্কের জন্যে ব্যাকুল তখন রাজকুমার সযত্নে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছে। শারীরিক সান্নিধ্য আর মানসিক নৈকট্য যে এক নয়, রাজকুমার তা বুঝেছে। রাজকুমারের অন্যতম দুর্বলতা নারীর শরীরের অনাবৃত দেখা। রিনিকে স্নানরতা অবস্থা দেখতে ব্যাকুল রাজকুমারকে রিনি ফিরিয়ে দিয়েছে। সরসী রাজকুমারের সামনে নিজেকে খুলে দিয়েছে। রাজকুমার কোন আকর্ষণবোধ করেনি। শারীরিক সম্পর্কে রাজকুমার জড়িয়ে পড়তে দ্বিধান্বিতা থেকেছে। রাজকুমার এক ধরনের মনোবৈকল্যে ভুগেছে। মনোরমা প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিতে কালীর সাথে শারীরিক সম্স্লর্ক তৈরির সুযোগ রাজকুমার গ্রহণ করেনি। ফ্রয়েডীয় মনস্তত্বে উপন্যাসের পাত্রপাত্রীরা সৃষ্টি হয়েছে। পাশাপাশি 'উপন্যাসের নায়ক সুনীলের ভাগ্যে আস্থা নেই। তাকে রুঢ় স্বভাবের মনে হয়। সাংসারিক চাহিদা পুরণ করতে সে প্রাণান্ত পরিশ্রম করে। সে টিউশনি করে। টাইপরাইটিং ও স্টেনোগ্রাফি অন্যদের শিখিয়ে অর্থ উপার্জনের চেষ্টা করে। মায়ার সঙ্গে নৈকট্যতা থাকলেও রোমান্সের আবহ তৈরি হয়নি মনের গভীরে। টিউশনির সুত্রে নন্দার সাথে তার পরিচয় হয়। নন্দার মৃত স্বামীর পত্রিকা 'দি পিপলস ভয়েস' এর পার্টনার হওয়ার সুযোগ সুনীল পায়। 'কালোবাজারি' বিষয়ে সম্স্লাদকীয় লেখার কারণে মালিকপক্ষের একজনের কোপানলে তাকে পড়তে হয়। 'অঘোরের' মেয়ের মানবিক বিষয় তাকে আন্দোলিত করে।

অঘোরের সাথে সুনীল বিরোধে জড়িয়ে পড়তে পারে না। এ উপন্যাসে বহু চরিত্র মায়া, ছায়া ও সুনীলের মনস্তাত্ত্বিক টানাপোড়েন উপন্যাসের বহিরাঙ্গন শোভিত করেছে। দেশভাগ একটি ভৌগলিক সীমা চিহ্নিত করলেও কোন মুক্তি দেয়নি এ উপলব্ধি সুনীলের। পুঁজিপতি সমাজ ও সুযোগ-সানী মানুষ বাকস্বাধীনতা চিন্তার প্রসারতার ক্ষেত্রে প্রতিবকতা তৈরি করেছে। মানুষের সম্পর্ক ও গৌণ নয়। 'হরফ' উপন্যাস দরিদ্র কম্পোজিটর কালাচাঁদ লেখক সত্তা নিয়ে আবির্ভুত। লেখক-প্রকাশক সম্পর্ক, লেখক কম্পোজিটর সম্পর্ক, কম্পোজিটরদের আর্থিক দুরবস্থা নিয়ে উপন্যাসের বুনট বাঁধন তৈরি হয়েছে। মানব মদ্যপায়ী। তার মদ্যপানের পেছনে একটি যুক্তি সে তুলে ধরে। লেখকের সৃজনশীলতার সাথে মদ্যপানের সম্পর্ক তৈরি করে সে এক ধরনের ভাবালুলতা সংযোজন করার চেষ্টা করে। পরক্ষণে উচ্চারিত হয়। লেখার জন্যে নেশা দরকার হয় এটা স্রেফ বাজে কথা। নেশা কোন কাজেই লাগে না লেখার। কোন লেখক যদি নিয়মিত নেশা করেঅন্য পাঁচজনের মত নেশার জন্যই করে।' সামাজিক অব্যবস্থায় মৃত্যুবরণ করে কালাচাঁদের স্ত্রী। মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কালাচাঁদ শোষিত সমাজ ব্যবস্থার চিত্র প্রত্যক্ষ করে।

'মাটির কাছের কিশোর কবি' মানিক বন্দোপাধ্যায়ের অসম্পূর্ণ উপন্যাস। মধ্যবিত্ত সংসারের কিশোর একটি মেয়েকে পাগলা কুকুরের ধাওয়া থেকে বাঁচাতে গিয়ে নিজেই কুকুরের হিংস্রতার শিকারে পরিণত হয়। সংসারের অনিয়ম কিশোর চিত্তে আলোড়ন তোলে। অসুস্থ অবস্থায় সে সমাজের নানা অনিয়ম নিচুতার পীড়নে অন্তর্দ্বন্দ্বে ভোগে একান্নবর্তী পরিবারের কিশোর বিচ্ছিন্ন সংসার থেকে বেড়িয়ে চাকরি খোঁজে। কিশোর দ্বিতীয় বিভাগে পাস করে। চাকরির সামান্য অর্থে জীবনসংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। কিশোর মনের বিভিন্ন কৌতুহল যাপিতজীবন ও সমাজ পরিপার্শ্ব এই উপন্যাসে ধরা পড়েছে। এক একান্নবর্তী পরিবার অভাবের তাড়নায় উপলব্ধি করে। 'দারিদ্র্য ভগবানের সৃষ্টি নয়, মানুষ মানুষের এদশা করেছে।' মানুষের তৈরি সমাজে অসম অবস্থান, মানবিক মূল্যবোধের অবক্ষয় যেমন দৃশ্যমান তেমন মানবিক সম্পর্ক ও মানুষের মনস্তত্ত্বের টানাপোড়েন সক্রিয়। মানিক বন্দোপাধ্যায় সমাজ পরিপার্শ্বের প্রতিদিনের পরিবর্তন তার উপন্যাসের বিষয়বস্তু হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। রাজনীতির ঘুর্ণী, হৃদয়বৃত্তি ও জিজ্ঞাসাকে নির্ভর করে উপন্যাস সমূহের বিস্তৃতি হয়েছে। সমাজের ভেতর বাস করে আমরা অনেক পরিবর্তন, চলমান ঘটনা ও মানবিক সম্পর্কের বহুমাত্রিকা সেভাবে অনুভব করি না। মানিক সেসব ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছেন। মানুষ তার অবচেতন মনে অন্তর্লীন রহস্য লালন করে তার ব্যবচ্ছেদ ফ্রয়েডীয়ভাবে করেছেন মানিক বন্দোপাধ্যায়। বিশ্বযুদ্ধকালীন ঘটনার প্রেক্ষিত, বাস্তবতা ও গ্রামীণ জনপদের মানুষের যাপিত সুখ-দুঃখে লীন হয়েছে তার সাহিত্যের মৌল প্রতিপাদ্য। মানিক বন্দোপাধ্যায় মার্কসীয় মতবাদের প্রতিফলন ঘটিয়েছে তার চরিত্র সৃষ্টি ও কাহিনী বিবৃতিতে। নাগরিক জীবনকে প্রভাবিত করে অর্থনীতির যে অনুঘটক তার প্রতিভাস মানিক সচেতনভাবে তার সাহিত্যে সংগ্রহ করেছেন।

মানিক বন্দোপাধ্যায়ের সফল গল্পগ্রন্থ 'প্রাগৈতিহাসিক'। এই গ্রন্থে মধ্যবিত্তের বাঁচা, সংগ্রাম ও সমাজচিত্র নিখুঁতভাবে বিধৃত হয়েছে। ডাকাত দলের এগারো জনের একজন ভিখু বসন্তপুরের বৈকুণ্ঠ

সাহার বাড়িতে ডাকাতি করতে গিয়ে কৌশলে ধরা পড়ে না। ভিখুর পায়ের পচন ধরে। পেহলাদের কাছে আশ্রয় নিয়ে সে নানা অভিজ্ঞতা অর্জন। নারী সঙ্গহীন জীবন তার ভালো লাগে না। তাকে হাতছানি দেয় অতীত। বিচিত্র অনুভব ও অসংখ্য চরিত্রের আবর্তন। ‘প্রাগৈতিহাসিক’ গল্প শুধু নয়। অন্যান্য গল্প ‘চোর’, ‘মাটির সাকী’ ‘যাত্রা’ ‘ফাঁসি’ ‘ভূমিকম্প’এ সংলাপ প্রক্ষেপণ ও কাহিনী বর্ণনায় দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন মানিক বন্দোপাধ্যায়। ‘পদ্মানদীর মাঝি’ ‘পুতুল নাচের ইতিকথা’ থেকে শুরু করে প্রাগৈতিহাসিকে’র কাহিনীতে যে সমাজ ও পরিপার্শ্ব চিত্রিত হয়েছে তা বাংলার হাজারো বছরের ঐতিহ্য আশ্রয়ী। মানিকের চরিত্ররা গ্রাম্য ও নগর জীবনের পোড় খাওয়া মানুষ। এই সব মানুষ নিষিদ্ধ জগতের পথ পেরিয়ে সত্য ও আলোর দিকে যাত্রা শুরু করেছে। মানিক বন্দোপাধ্যায় বিচিত্র মানুষকে তাঁর সাহিত্যে তুলে এনেছেন। তাঁর সাহিত্য আমাদের চিন্তা জগতের বিশাল রহস্য উদঘাটনে প্রাণিত করে। মানিক বন্দোপাধ্যায়ের সাহিত্য নিবিড় পর্যবেক্ষণ ও জীবনের অভিজ্ঞতায় জায়িত।

সাইফুজ্জামান